প্রেসিডেন্সি কলেজ
পদার্থবিদ্যা বিভাগের ইতিহাস

অর্ণব রায়চৌধুরী, সুব্রত সেন ও সুবিনয় দাশগুপ্ত

।। উপক্রমণিকা ।।

শিক্ষাকেন্দ্র মাত্রেই গ'ড়ে ওঠে প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্তু এমনই বিচিত্র জীব মানুষ, যে সে সেই প্রয়োজনে গড়ে-ওঠা শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গেও স্থাপন করে তার হৃদয়ের নিবিড় ভালবাসার বন্ধন। তাই প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে যাঁরা কখনও যুক্ত ছিলেন বা এখনও যুক্ত আছেন, তাঁরা যে এই বিভাগকে ভালবাসবেন, এর বিষয়ে জানতে আগ্রহী হবেন, এইটাই স্বাভাবিক। সে কথা মনে রেখেই আমরা আমাদের স্বল্প সামর্থ্য নিয়েই এই কঠিন প্রয়াসে উদ্যমী হয়েছি।

মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে আমরা প্রায় পঁচিশজন প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক ও রিসার্চ স্কলারের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে তথ্য সংগ্রহ করি। তাঁরা নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট ক'রে আমাদের সঙ্গে যে আলোচনা করেছেন, তারই ফলে এই ইতিহাস লেখা সম্ভব হ'ল। তাঁদের সবার নাম এখানে উল্লেখ করা গেল না। তবে এই ইতিহাস রচনার পেছনে তাঁদের প্রত্যেকেরই অবদান রয়েছে। এছাড়া কলেজের সেন্টিনারি ভল্যুম, অ্যানুয়েল রিপোর্টস এবং অন্যান্য কিছু গ্রন্থও আমাদের কাজে লেগেছে। তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি শ্রীরাণা দাশগুপ্ত ও শ্রীপলাশবরণ পালমজুমদারের কাছে। অধ্যাপক অমলকুমার রায়চৌধুরী আমাদের সমস্ত পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প'ড়ে সংশোধন ক'রে দিয়েছেন। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার ক'রে তাঁর সস্নেহ সহযোগিতার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়।

এরকম একটা গল্প আছে, একটি অর্ধেক জলপূর্ণ কলসী দেখিয়ে দু'জন লোককে কলসীটি সম্পর্কে কিছু বলতে বলা হ'ল। তাতে একজন বলল, "কলসীটার অর্ধেকটা খালি", অন্যজন বলল, "কলসীটার অর্ধেকটা ভরা।" এই ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের সময়ে আমাদের বারবার গল্পটা মনে পড়ছিল। দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার জন্য আমরা একই প্রশ্নের অনেক সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় পরস্পরবিরোধী উত্তর পেয়েছি। সেসব ক্ষেত্রে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী যতদূর সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা করতে আমরা চেষ্টা করেছি। এছাড়াও যে কোনও প্রথম প্রচেষ্টাতেই কিছু অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা থেকে যাওয়া প্রায় অনিবার্য। যদি এই আলোচনায় কারও কোনও উল্লেখযোগ্য বাদ বা তথ্যের ভুল চোখে পড়ে, আমাদের জানালে বাধিত হব। স্মারক-পত্রিকার

দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না। তাহ'লেও পরে যদি কখনও এই বিভাগের আরও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার চেষ্টা করা হয়, তবে আমাদের আলোচনার ভুলত্রুটিগুলো জানা হ'য়ে থাকা দরকার।

অনেকে বলেছিলেন, পুনর্মিলন উৎসবে সবাই আসেন আনন্দ করতে,—এখানে কোনও অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা না করাই ভালো। তবু যদি আমরা মাঝে মাঝে এমন কথা লিখে থাকি যা কারও কারও কাছে অপ্রিয় মনে হ'তে পারে, তবে সেটা এই বিভাগের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কারও থেকে কম ব'লে যে লিখেছি তা নয়। অতীতে এই বিভাগে যেসব ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা ছিল তার সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে আমরা এই বিভাগকে সুন্দরতর ক'রে গ'ড়ে তুলতে চাই।

(বিঃ দ্রঃ—আমরা এই আলোচনায় শিক্ষকদের নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে সাল উল্লেখ ক'রে শিক্ষকতাকাল বুঝিয়েছি, জীবনকাল নয়।)

॥ প্রাক্-জগদীশচন্দ্র যুগ : পদার্থবিদ্যা বিভাগের গোড়াপত্তন ॥

প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যা চর্চার ইতিহাসকে বুঝতে গেলে প্রথমে কলেজের ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা উল্লেখ ক'রে নেওয়া ভালো। তারপর সেই পশ্চাৎপটকে পেছনে রেখে আমরা পদার্থবিদ্যা চর্চার প্রবাহ—যা একটি ক্ষীণ ধারা থেকে ধীরে ধীরে প্রবল স্রোতস্বিনী হ'য়ে উঠল—তার ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌বৃন্দ হিন্দু ছেলেদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা দেবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৮১৭ সালে লক্ষাধিক টাকা চাঁদা তুলে গরানহাটার একটি ভাড়া বাড়ীতে ২০ জন ছাত্র নিয়ে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজ শীঘ্রই অত্যন্ত জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে এবং ছাত্রসংখ্যাও দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। প্রথমদিকে কলেজের দুটি ভাগ ছিল—পাঠশালা (স্কুল) ও মহাপাঠশালা (কলেজ)। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়ন তখনই মহাপাঠশালার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল ; তবে পদার্থ-বিদ্যা চর্চার কথা বিশেষ জানা যায় না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো, একমাত্র নিউটনীয় বলবিদ্যা ছাড়া পদার্থবিদ্যার আর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখারই তখন নিতান্ত শৈশবকাল চলছে। তড়িৎ ও চুম্বকত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক তখন সবেমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, আলোর তরঙ্গবাদ তখনও সর্বজন-স্বীকৃত হয় নি এবং **Thermodynamics** ব'লে কোনও বস্তু তখন ছিল না।

১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় এবং নতুন দালান তৈরী ক'রে হিন্দু কলেজকে তার পাশে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রধানতঃ শিক্ষানুরাগী ধনীদের ব্যক্তিগত দানে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থাপিত হ'লেও ক্রমশঃ হিন্দু কলেজ নানাবিধ আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হ'তে থাকে এবং সরকারী সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হয়। এইভাবেই ধীরে ধীরে কলেজটি প্রায় পুরোপুরি সরকারী তত্ত্বাবধানে এসে পড়ে। শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্য পৃথক ক'রে না রেখে সমস্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের এই

কলেজে পড়তে দেওয়ার একটি প্রস্তাব ওঠে। তৎকালীন অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিই এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮৫৫ সালে প্রতিষ্ঠানটিকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়। স্কুল অংশটির নাম হিন্দু স্কুলই থেকে যায়; কলেজ অংশের নতুন নামকরণ হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং সেখানে সর্ব সম্প্রদায়ের ছেলেদেরই পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার দেওয়া হ'ল সরকারের ওপর। জন্মলগ্নে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল চারটি বিভাগে বিভক্ত : **General, Law, Engineering** এবং **Medical.** মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩২, যার মধ্যে জেনারেল ব্রাঞ্চে ছিল ৯৪ জন। পরবর্তীকালে এই একটি ব্রাঞ্চই প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে পরিচিত থেকে যায়।

এতদিন পর্যন্ত কলেজে যেসব বৃত্তি পরীক্ষার প্রচলন ছিল, কলেজের শিক্ষকরাই সেগুলি পরিচালনা করতেন ও খাতা দেখতেন। ১৮৫৭ সালে পাঠক্রম নির্দেশ ও পরীক্ষা পরিচালনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভিন্ন বৃত্তি পরীক্ষার পরিবর্তে প্রবেশিকা পরীক্ষা, **F. A. (First Arts), B. A.** এবং **M. A.** অনার্স পরীক্ষার প্রচলন হ'ল। সে সময়ে **B. A.** পরীক্ষায় অনার্স ছিল না, ঐচ্ছিক বিষয় বাদে সব ছাত্রকে একই পাঠক্রম পড়তে হ'ত। অনার্স ছিল **M. A** -তে এবং সে পরীক্ষা দেওয়া যেত **B. A.** পরীক্ষার পর কলেজে এক বছর অধ্যয়ন ক'রে। অল্পকালের মধ্যেই **F. A.** ও **B. A.** পরীক্ষায় একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে রসায়ন শিক্ষাদান শুরু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে রসায়ন পড়ার গভীর আগ্রহ দেখা যায়। ১৮৭২ সালে **B. A.** পাঠক্রমের দুটি ভাগ ক'রে দেওয়া হয়—**A** এবং **B** পাঠক্রম। **A** পাঠক্রমে জোর দেওয়া হ'ত কলার ওপর এবং **B** পাঠক্রমে বিজ্ঞানের ওপর। তদানীন্তন ছাত্রদের মধ্যে **A** অপেক্ষা **B** পাঠক্রম পড়ার দিকেই বেশী ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। এর বছর-দশেক পরে **B. A.** অনার্স পাঠক্রমের প্রবর্তন হয় এবং তাতে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন যুগ্মভাবে একটি পাঠ্য বিষয়ের মর্যাদা লাভ করে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৮৮৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের **B. A.** পরীক্ষাতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

এখন পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি, তার থেকে সহজেই বোঝা যায়, গত শতাব্দীর শেষদিকেই প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যা তথা বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, শতাব্দীটির প্রথমেই ঘটেছিল শিল্প-বিপ্লব। তার আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানচর্চা ছিল মুষ্টিমেয় কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তির অবসর বিনোদনের উপায় মাত্র। শিল্প-বিপ্লবের ফলেই বিজ্ঞান প্রথম সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকেও বিপুলভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করে এবং তখন থেকেই ব্যাপক বিজ্ঞানশিক্ষার আগ্রহ দেখা যায়। আজ থেকে ১০০ বছর আগে পদার্থবিদ্যার চেয়ে রসায়নচর্চার ফল অনেক বেশী প্রত্যক্ষগোচর ছিল। সুতরাং সর্বত্র রসায়নশিক্ষার প্রতিই ছাত্রদের উৎসাহ ছিল বেশী। প্রেসিডেন্সি কলেজেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ১৮৭৩ সালে অত্যন্ত শক্তিমান শিক্ষক আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার (১৮৭৩-৯৩) এই কলেজের রসায়ন

বিভাগে যোগদান করেন এবং রসায়ন শিক্ষাদানের মান খুব উচ্চে উত্তোলিত করেন। কিন্তু পদার্থবিদ্যাও বেশীদিন উপেক্ষিত থাকে নি। গোড়ার দিকের পদার্থবিদ্যার শিক্ষকদের মধ্যে উইলিয়াম বুথ এম্. এ , এস্-সি. ডি. (১৮৭৬-৮৩, ৮৭-৯২) উল্লেখযোগ্য।

আমরা জানি, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে কয়েকজন দিকপালের আবির্ভাব হয়েছিল। দেখতে দেখতে থার্মোডিনামিক্সের সূত্রাবলী, তাপের আণবিক তত্ত্ব ও ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণসমূহের ওপর ভিত্তি ক'রে ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার অনন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত সৌধ গ'ড়ে ওঠে এবং সেই সৌধের বিস্ময়কর দ্যুতি ও ঔজ্জ্বল্য পৃথিবীর সর্বত্র মেধাবী ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঠিক সেই সময়েই প্রেসিডেন্সি কলেজে ব্যাপকভাবে ভারতীয় শিক্ষক নিয়োগ শুরু হয়। ১৮৮৫ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র (১৮৮৫-১৯১৫) পদার্থবিদ্যা বিভাগে এবং ১৮৮৯ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র (১৮৮৯-১৯১৬) রসায়ন বিভাগে যোগদান করেন।

বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাও প্রয়োজন। পেড্লারই প্রথম ক্লাসের মধ্যে রাসায়নিক পরীক্ষা ক'রে দেখান এবং ১৮৭৫ সাল থেকে নিয়মিত প্র্যাক্টিকাল ক্লাস নেওয়া আরম্ভ করেন। পদার্থবিদ্যারও কিছু ল্যাবরেটরির সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় হ'য়ে যায়। সেই নিতান্ত দৈন্যদশাপূর্ণ ল্যাবরেটরিতেই জগদীশচন্দ্র নিজের উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ে দীর্ঘকাল গবেষণায় রত রইলেন এবং ১৮৯৫ সালে কুস্ট্যালের সাহায্যে বৈদ্যুতিক রশ্মির Polarisation নিয়ে মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। পরের বছরই তিনি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্পর্কে যুগান্তকারী কিছু কাজ করেন এবং ১৮৯৭ সালে লণ্ডনে গেলে রয়েল সোসাইটিতে বিপুল অভিনন্দন পান।

এতদিন পর্যন্ত মনে করা হ'ত, অন্যত্র আবিষ্কৃত বিদ্যা পর্যালোচনা ও আয়ত্ত করাই প্রেসিডেন্সি কলেজের কাজ। জগদীশচন্দ্রের প্রতিভাই এখানে মৌলিক গবেষণার সূত্রপাত ক'রে একটি নূতন যুগের সূচনা করল এবং প্রমাণ ক'রে দেখাল, ভারতীয় মস্তিষ্ক বিজ্ঞানচর্চার অনুপযোগী ব'লে অনেকে যে অভিযোগ করতেন তা সম্পূর্ণ অমূলক।

।। আচার্য জগদীশচন্দ্র ঃ একটি যুগসন্ধি ।।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তখন স্যার জন ইলিয়ট পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। সে সময়ে কলেজে ভারতীয় অধ্যাপকদের বেতন ছিল ইংরেজ অধ্যাপকদের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ। এই বৈষম্যের প্রতিবাদে জগদীশচন্দ্র বসু তিন বছর বিনা বেতনে অধ্যাপনা করেছিলেন। তারপর কর্তৃপক্ষ তাঁর দাবী মেনে নিতে বাধ্য হন।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে জগদীশচন্দ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উপর গবেষণা আরম্ভ করেন। এই সময়েই কলেজের ল্যাবরেটরিগুলির সংস্কার শুরু হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রসায়ন বিভাগের নতুন

পরীক্ষাগার তৈরী হয়েছিল। ১৮৯৭ সালে পুরান কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি ফিজিক্সের জন্য ম্যাগনেটিক ও ফোটোগ্রাফিক ল্যাবরেটরিতে রূপান্তরিত হয়। কলেজে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি ডাইনামোও এই ঘরে বসান হয়েছিল।

এই শতকের গোড়ার দিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার মান উন্নয়নের চেষ্টা চালায়। ১৯০২ সালে বি. এস-সি. কোর্স চালু হবার পর পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিজ্ঞান পাকাপাকিভাবে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ফার্স্ট আর্টসের পরিবর্তে I. A. ও I. Sc. কোর্স চালু করা হয়। I. Sc.-তে প্র্যাকটিকাল ক্লাস ছিল বাধ্যতামূলক। M. Sc. পরীক্ষার পরিকল্পনাও এই সময়ে করা হয়েছিল।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য বসু বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। তখন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ এখনকার মত সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ ছিল না। পুরান বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় বিভাগটি ছড়ান ছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে জগদীশচন্দ্রের নিজস্ব ঘর। দোতলায় পশ্চিমদিকে (বর্তমানে গণিত বিভাগের অন্তর্গত) একটি ঘর লেকচার রুম হিসেবে ব্যবহৃত হত। মেন বিল্ডিংএর পিছনে টিনের শেড দেওয়া ঘরে ছিল ফিজিক্সের ল্যাবরেটরি। তারই উত্তরপ্রান্তে একটা ছোট ওয়ার্কশপ। ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতি মন্দ ছিল না, কিন্তু জায়গাটা ছিল বড় ছোট আর অস্বাস্থ্যকর; কাজ করার সময়ে গায়ে গায়ে লেগে যেত। জগদীশচন্দ্র সে সময়ে জড় ও প্রাণীর সাড়ার সমতার উপর গবেষণা করছিলেন। আর কেউ তখনও গবেষণা শুরু করেন নি।

ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বাড়ার ফলে কলেজের সমস্ত বিভাগেই জায়গার অভাব দেখা দেয়। অধ্যক্ষ জেমসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্প্রসারণে রাজী হন। কলাবাগান বস্তি তুলে দিয়ে ১৯১০ সালে নতুন বাড়ি তৈরী শুরু হল। ছোটলাট এডোয়ার্ড নর্ম্যান বেকারের নাম অনুসারে এর নাম রাখা হয় বেকার ল্যাবরেটরি। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের বেশির ভাগই অধ্যাপক হ্যারিসনের প্ল্যান অনুযায়ী তৈরী হয়েছিল। ১৯১৩ সালের ২০শে জানুয়ারী লর্ড কারমাইকেল বেকার ল্যাবরেটরির উদ্বোধন করেন। তারপর থেকে প্রতি বছর ঐ দিনটিতে কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা বিভাগ তখন নতুন বাড়িতে উঠে আসে। পদার্থবিদ্যার প্রত্যেক অধ্যাপকের জন্য এক একটি ঘর নির্দিষ্ট হয়। প্র্যাকটিকাল রুমের পরিবর্তনকে নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক বলা যেতে পারে। পদার্থবিদ্যার লেকচার থিয়েটারে বহুদিন কলেজের যাবতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। অডিটোরিয়াম তৈরী হবার পর এই প্রাচীন ঘরটির গৌরবময় অধ্যায় সমাপ্ত হয়।

১৯১৫ সালে অবসর গ্রহণের পর জগদীশচন্দ্র কলেজের প্রথম ইমেরিটাস প্রফেসর নিযুক্ত হন। আজীবন তিনি এই পদ অলংকৃত করেছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। কলেজে শেষ দু-তিন বছরে তিনি নিজের গবেষণা ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন। তাই অধ্যাপনার দিকে নজর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

আচার্য বসু ছিলেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। ফিটনে চড়ে তিনি কলেজে আসতেন; তাঁর পোষাকে কোনও খুঁত পাওয়া যেত না। ছাত্রদের সামনে ক্লাসে তিনি অনেক পরীক্ষা করে দেখাতেন। যন্ত্রপাতি সাজানোর ভার থাকত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তীর উপর। কখনও ঠিকমত এক্সপেরিমেন্ট না হলে তিনি বিরক্ত হতেন। সূচীপতন নৈঃশব্দের মধ্যে তাঁর ক্লাস চলত। মাঝে মাঝে ছোট্ট কথায় সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিতেন তিনি। প্রধানতঃ তাঁর কাজের মাধ্যমে প্রেসিডেন্সি কলেজ বিশ্বে স্বীকৃতিলাভ করে। একটি বিষয়ে অবশ্য জগদীশচন্দ্র ব্যর্থ হয়েছিলেন। কলেজে একটি স্থায়ী রিসার্চ গোষ্ঠী গড়ে তোলার কোনও চেষ্টা তিনি করেন নি।

তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের উপর গবেষণায় জগদীশচন্দ্র ছিলেন হার্ৎস্ এবং অলিভার লজের সুযোগ্য উত্তরসূরী। ক্ষুদ্র মৌলিক যন্ত্রের সাহায্যে তিনি ০·৫-২·৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গে দৃশ্য আলোকের সমস্ত ধর্মই বিদ্যমান প্রমাণে সমর্থ হন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি বিদ্যুৎ-রশ্মির সমাবর্তন (Polarization)-এর উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর এই প্রবন্ধ পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করেছিল। ১৮৯৬ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. এস-সি. উপাধিতে ভূষিত করেন।

তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের গ্রাহক যন্ত্রের উন্নতি সাধনের চেষ্টায় জগদীশচন্দ্র অজৈব পদার্থের উত্তেজনার প্রতি আকৃষ্ট হন। বিভিন্ন ধাতুর উপর আলোকরশ্মি, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও যান্ত্রিক কম্পনের ক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি পরীক্ষা চালান। এই বিষয়ে তিনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পারীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা কংগ্রেসে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এরপরের তিরিশ বছর আচার্য বসু উদ্ভিদ ও প্রাণীর পেশীর মধ্যে তুলনামূলক শারীরবিদ্যা-বিষয়ক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি দেখান বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক ও রাসায়নিক বিভিন্ন প্রকার উত্তেজনায় ধাতু এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর পেশী একইভাবে সাড়া দেয়। ক্রেস্কোগ্রাফ, ফিগমোগ্রাফ, পোটোমিটার প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে তিনি ক্ষীণ গতিকে বহুগুণে বর্ধিত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পেশীর সঙ্কোচন এইসব যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন। পরে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে তিনি উদ্ভিদের জলশোষণ ও সালোক সংশ্লেষ সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করেছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের পরে বিভাগীয় প্রধান হয়ে এলেন সি. ডবলিউ. পীক। কলেজের সায়েন্স লাইব্রেরির পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন। বেকার ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণের পর এই লাইব্রেরি নতুন বাড়িতে উঠে যায়। এখন পুরান ঘরটিতে ফিজিক্স পাস প্র্যাকটিকাল ক্লাস হয়ে থাকে।

ছাত্রদের কাছে পীক সাহেব 'ছাতাওয়ালা' পীক বলে পরিচিত ছিলেন। সেই সময়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবহাওয়া অফিসের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করতেন। জগদীশচন্দ্র এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। প্রফেসর পীক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এই কাজের অছিলায় পীক কলেজে প্রায়ই আসতেন না।

পীকের পরবর্তী বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ই. পি. হ্যারিসন। বর্তমানে ছাত্রদের মধ্যে যে ফিজিক্স পড়ায় ঝোঁক দেখা গেছে, তাঁর মূলে ছিলেন এই হ্যারিসন সাহেব ও তাঁর উত্তরাধিকারী ডি. বি. মীক (১৯১৭-২০)। তাঁরা দুজনেই ছাত্রদের পড়ায় উৎসাহ দিতেন। অধ্যাপকদের তখন প্র্যাকটিকাল ক্লাসে না আসা একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। হ্যারিসন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটালেন। তাঁর চেষ্টায় কলেজের ল্যাবরেটরির প্রভূত উন্নতি হল। ভাল মিস্ত্রি ও মেশিন যোগাড় করে তিনি ওয়ার্কশপটিকে আধুনিক করে তোলেন। সে সময়ের আর একজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষক দ্বিজেন্দ্রকুমার মজুমদার, ছাত্রদের প্র্যাকটিকাল ক্লাসে তিনিই সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতেন। হ্যারিসন সাহেব প্র্যাকটিকালের উপর একটা বই লিখেছিলেন। তার মালমসলা সবই এসেছিল দ্বিজেনবাবুর কাছ থেকে। ছাত্রদের মধ্যে বইটা বেশ চালু ছিল।

জগদীশচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে এসেছিলেন, তখনকার পদার্থবিদ্যা বিভাগের চেহারা ছিল আজকের দিনের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম। আর অবসর গ্রহণের সময়ে যে পদার্থবিদ্যা বিভাগকে তিনি পেছনে রেখে গেলেন, তার সঙ্গে আজকের পদার্থবিদ্যা বিভাগের তেমন কোনও মৌলিক পার্থক্য চোখে পড়ে না। মনস্বী আচার্যের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এই বিভাগকে শৈশব থেকে একেবারে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে এনে উপনীত করল।

॥ ১৯১৫—১৯৪৭ ॥

আমরা দেখেছি, আচার্য জগদীশচন্দ্রের যুগে পদার্থবিদ্যা বিভাগ প্রথম ভ্রূণ-অবস্থা কাটিয়ে উঠে একটি নিজস্ব আকার নিল। পর্যাপ্ত জায়গা জুড়ে বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মিত ক্লাসরুম ও ল্যাবরেটরিতে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই বিভাগের পঠন-পাঠনের উন্নতি ঘটবে এমন মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নানা কারণে তা হয়নি। বিশের ও ত্রিশের দশক দু'টি এই বিভাগের ইতিহাসে নানা দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত ম্লান ও বিবর্ণ দু'টি দশক।

জগদীশচন্দ্রের সময়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানেও প্রেসিডেন্সি কলেজেরই একাধিপত্য ছিল। ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই কলেজের গৌরব অনেকখানি হ্রাস পেয়ে গেল। বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠার পরেও বরাবরই প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও প্র্যাকটিকাল ক্লাসের সুযোগ র'য়ে গেছে। কিন্তু তার গুরুত্ব বিজ্ঞান কলেজের থেকে অনেক কম। বিজ্ঞান কলেজের ল্যাবরেটরি পরবর্তী-কালে যে পরিমাণ ব্যক্তিগত দান ও সরকারী অর্থসাহায্য পেয়েছে, সেই তুলনায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরি কিছুই পায় নি।

এই গৌরবহানির পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পদার্থবিদ্যা বিভাগের ইতিহাস প্রায় ঘটনাবিরল বললেই চলে। এর মধ্যে কখনও বিভাগের উন্নতির জন্য কোনও বিশেষ প্রচেষ্টার কথা জানা যায় না। দেশে তখন চলছে স্বাধীনতার আন্দোলন। পদার্থবিদ্যার অনেক ছাত্রও এই সময়ে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিতেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ মাঝে মাঝে কলেজের দৈনন্দিন পঠন-পাঠনকে ব্যাহত করত। জগদীশচন্দ্রের পরেও সি. ডবলু. পীক, ই. পি. হ্যারিসন, ডি. বি. মীক প্রমুখ ইংরেজ শিক্ষকরা অধ্যাপনা করেছেন। মোটামুটিভাবে ১৯৩০ সালের মধ্যেই এই বিভাগের শিক্ষক-তালিকা সম্পূর্ণ ভারতীয় হ'য়ে যায়। ১৯১৭ সালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ১৯২২ সালে স্নেহময় দত্ত এবং ১৯২৭ সালে কুলেশচন্দ্র কর—এই তিনজন খ্যাতনামা বাঙালী অধ্যাপক এই কলেজে এলেন।

অধ্যাপক মহলানবীশ ১৯২৩ সাল থেকে শুরু ক'রে দীর্ঘকাল বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। প্রথমদিকে তিনিও কিছুকাল আলিপুরের আবহবিজ্ঞান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান এবং আবহবিজ্ঞান নিয়ে কিছু গবেষণা করেছিলেন। তার পরে পদার্থবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে আবহবিজ্ঞান কার্যালয়ের যোগাযোগ ছিন্ন হ'য়ে যায়। সেই সময় থেকেই প্রশান্তবাবু স্ট্যাটিস্টিক্‌সে আগ্রহী হ'য়ে উঠতে থাকেন। বর্তমান M. Sc. ল্যাবরেটরির ভেতরের ঘরগুলোতে তিনি শুভেন্দুশেখর বসু, রাজচন্দ্র বসু, সমর রায় প্রমুখ সহকর্মীদের নিয়ে খুব উদ্যমের সঙ্গে স্ট্যাটিস্টিক্‌সের গবেষণা করতেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৪৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে স্ট্যাটিস্টিক্‌স বিভাগ খোলা হয়। ১৯৪৫ সালে তিনি রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং ঐ বছরই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হ'লেন। তিন বছর অধ্যক্ষের পদে থাকার পর প্রশান্তবাবু ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন এবং ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের গঠনকার্যে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে এই ইনস্টিটিউটের কাজ হ'ত ; পরে ১৯৫১ সালে তা বরানগরে স্থানান্তরিত হয়। এই বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে অধ্যাপক মহলানবীশ যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা সর্বজনবিদিত। তবে স্ট্যাটিস্টিক্‌স নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকায় পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান থাকার সময়েও এই বিভাগ তাঁর প্রতিভার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হ'তে পারে নি। সে সময়ের ছাত্ররা যে প্রত্যাশা নিয়ে তাঁর ক্লাসে আসতেন, তাঁদের অনেকেরই সে প্রত্যাশা পূর্ণ হ'ল না ব'লে মনে ক্ষোভ থাকত। প্রশান্তবাবু ক্লাসে আসতেন একটি বিরাট মোটা বাঁধানো নোটের খাতা হাতে নিয়ে। শিক্ষাদানেও তাঁর কতগুলো অভিনব প্রণালী ছিল, যেমন হয়তো গণিতের জটিল চিহ্ন সমাকুল ধাপও তিনি মুখে মুখেই dictation দিতেন এবং কোনও বাঁধাধরা পাঠ্যসূচী মানতেন না। তবে এর মধ্যেও ছাত্ররা মাঝে মাঝে একটি উদ্ভাবনশীল মনের পরিচয় পেতেন।

অধ্যাপক স্নেহময় দত্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের D. Sc. ডিগ্রী অর্জন ক'রে দেশে ফিরেই প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন। তিনি কলেজে আসতেন নিখুঁত সাহেবী পোষাক প'রে এবং তাঁর চালচলনের মধ্যেও একটু সাহেবী কায়দা প্রকাশ পেত। ইংল্যাণ্ডে তিনি ফাউলারের কাছে Spectroscopy নিয়ে কাজ করেছিলেন এবং দেশে ফিরেও তিনি এই বিষয়ে গবেষণা চালাতে চেষ্টা করেন। সেই সময়ে

এই বিভাগে আর কেউ পরীক্ষামূলক গবেষণা করতেন না এবং তার সুযোগও বিশেষ ছিল না। ডঃ দত্তকেও তাঁর কাজে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল। হয়তো সেই কারণেই তাঁর শেষের দিকের ছাত্ররা তাঁর মধ্যে গবেষণা ও শিক্ষকতাকার্যে আর অতটা যত্ন বা উৎসাহ দেখেননি।

এক সময়ে স্নেহময়বাবু বহু পদার্থের—বিশেষ ক'রে বিভিন্ন অ্যালকালি ধাতু ও হ্যালোজেনের—[absorption spectra] নিয়ে প্রধানতঃ পরীক্ষামূলক ও কিছু তাত্ত্বিক গবেষণা ক'রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এখন যেখানে বিভাগীয় প্রধানের ঘর, সেখানে তাঁরই উদ্যোগে Rowland Mountingএর ওপর একটি কনকেভ গ্রেটিং স্থাপন করা হয় এবং কিছুদিন তাতে ভালো কাজও হয়েছিল। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যখন ঘরটি এ. আর. পি.—কে ছেড়ে দিতে হ'ল, তখন গ্রেটিংটি অপসৃত করতে হয়। ১৯৩৭ সালে ডঃ দত্ত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিভাগের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করার পর তিনি রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ হ'য়ে চ'লে যান। এক সময়ে পদার্থবিদ্যা প্র্যাকটিকালে ডঃ দত্তের লেখা একটি পাঠ্যপুস্তক বহুল প্রচলিত ছিল। এই খ্যাতনামা অধ্যাপক পরলোকগমন করেছিলেন ১৯৫৫ সালে।

অধ্যাপক কুলেশচন্দ্র কর এই বিভাগের ইতিহাসে নানা দিক দিয়ে শিক্ষক হিসাবে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন। একাধারে প্রতিভাসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী ও উৎকৃষ্ট শিক্ষক এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দুর্লভ। কুলেশবাবু ছিলেন তেমনই একজন বিরল অধ্যাপক। পদার্থবিদ্যার অন্তর্নিহিত ভৌতিক চিন্তাবলী এবং বিষয়টির গাণিতিক দিক—এই দু'য়ের মধ্যে নিপুণ সমন্বয় ক'রে তিনি পড়াতেন। শিক্ষাদান ছিল তাঁর কাছে একটি পবিত্র কর্তব্যের মতো। জটিল জিনিষকেও অত্যন্ত সরলভাবে বোঝানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল এবং বোর্ডে কঠিন গণনা বিস্তৃতভাবে করার সময়েও কখনও তাঁর মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত বা ইতস্তত ভাব দেখা যেত না। সর্বদাই গম্ভীর ও চিন্তামগ্ন থাকতেন ব'লে অধিকাংশ ছাত্রই তাঁর সঙ্গে একটু সসম্ভ্রম দূরত্ব রেখে চলতেন। কিন্তু যাঁরা সেই গাম্ভীর্যের প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর খুবই মধুর সম্পর্ক গ'ড়ে উঠত। কুলেশবাবু ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধা ও আদর্শবাদী,—আজীবন খদ্দরের কাপড়ই ছিল তাঁর পরিধেয়। বোধ করি, কুলেশবাবুর এমন কোনও ছাত্র নেই, যিনি শিক্ষক হিসাবে ও মানুষ হিসাবে তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন নি।

১৯২২ সালে M. Sc.-র ছাত্র থাকা-কালেই মাত্র ২২ বছর বয়সে কুলেশবাবুর প্রথম গবেষণাপত্র Physical Review-তে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর বিপুল-পরিমাণ গবেষণাকার্যের মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত হ'ল ছড়-টানা তার ও পিয়ানোর তারের তত্ত্ব। বিভিন্ন যন্ত্রবাদনে তাঁর দক্ষতা ছিল। সেই সঙ্গীতপ্রীতিই তাঁকে বাদ্যযন্ত্রের বিজ্ঞানে অনুরাগী ক'রে তোলে। তাঁর আগে রমন ছড়-টানা তারের যে তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন, তাতে কিছু অসঙ্গতি ছিল। ডঃ কর তা দূর করেন। ছড়ের ওপর চাপ কমানো-বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তারের বিভিন্ন বিন্দুতে গতিবেগের পরিবর্তনও তিনি হিসাব ক'রে দেখান।

স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সে তিনি ফ্লাকচুয়েশন-সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যার গাণিতিক আলোচনা

করেছিলেন। তার মধ্যে প্রধান হ'ল দু'টি পদার্থের মিশ্রণের অতি সামান্য অংশের মধ্যে কনসেণ্ট্রেশনের ফ্লাকচুয়েশন নিয়ে গণনা—যার ওপর ভিত্তি ক'রে পরে তিনি দ্রবণের কম্প্রেসিবিলিটির সঙ্গে কনসেণ্ট্রেশনের সম্পর্ক নির্ণয় করেন। কুলেশবাবুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল, intermittent action-এর তত্ত্ব, অর্থাৎ কোনও বস্তুর ওপর কিছুক্ষণ পর পর ইম্‌পালসিভ ফোর্স দিতে থাকলে তার আচরণ কেমন হবে সেই বিষয়ে হিসাব। এই তত্ত্ব ব্রাউনিয়ান মোশনের আলোচনায় ব্যবহার করে তিনি আইনস্টাইনের সমীকরণ প্রমাণ করেন। এই সমস্ত গবেষণাই দেশে-বিদেশে বিজ্ঞানীমহলে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল এবং এর সমস্তই মোটামুটি ১৯৩৫ সালের আগেকার কাজ।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকাল এই কৃতী বিজ্ঞানীর কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি। ১৯২৯ সালে তিনি wave statistics নামে একটি নূতন বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন, যার তিনি বাংলায় নামকরণ করেছিলেন 'সমষ্টি তরঙ্গবাদ'। এর সাহায্যে তিনি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বহু তত্ত্ব এবং আলোর স্ক্যাটারিং, তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়া, ক্লাইন-নিশিনা সূত্র ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সমস্যার সম্পূর্ণ অন্যভাবে সমাধান সম্ভব ব'লে দাবী করেন। কিন্তু এই দাবী বিজ্ঞানীমহলে আজও স্বীকৃত হয়নি। কুলেশবাবু ১৯৩৫ সালের পর থেকে বলতে গেলে শুধুমাত্র এই একটি বিষয়েই একের পর এক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন, যেগুলো চিন্তাজগতে বিশেষ সাড়া জাগায় নি। কুলেশবাবুর জীবনের শেষ পর্যায়ের আলোচনা এই ইতিহাসের পরবর্তী অংশটিতে করা হবে।

এবার আমরা কয়েকজন শিক্ষকের নাম করব, যাঁরা ছিলেন ছাত্রদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাঁরা হলেন দ্বিজেন্দ্রকুমার মজুমদার (১৯০২—৩৯) চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯০৬—৪১), নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী (১৯১১—১৬, ২৪—৪২) এবং কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯১১—৪৬)। বন্ধনীর মধ্যের সালগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, এঁরা প্রত্যেকেই দীর্ঘদিন এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পদমর্যাদায় এঁরা পূর্বালোচিত খ্যাতনামা অধ্যাপকদের অপেক্ষা ন্যূন হলেও এঁদেরই দীর্ঘকালের অনলস পরিশ্রমে পদার্থ-বিদ্যা বিভাগের একটা শক্ত ভিত্তি তৈরী হয়ে যায়। প্র্যাকটিকাল ক্লাসের ভার এঁদেরই ওপর ছিল এবং ছাত্ররা সব ব্যাপারেই নিজেদের সুবিধা-অসুবিধার কথা এঁদেরই জানাতেন। এঁদের হাতে পিতাও প্র্যাকটিকাল শিখেছেন, পুত্রও প্র্যাকটিকাল শিখেছেন, এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে।

এই শিক্ষকদের মধ্যে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের কথা আরেকটু বিশদভাবে বলা প্রয়োজন। কেননা তিনি থিওরির ক্লাসেও বিপুল সাফল্য ও ছাত্রদের প্রীতি অর্জন করেছিলেন। ধুতি-চাদর পরা এই খাঁটি বাঙালীটির আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যেই একটু কবি-কবি ভাব ছিল। কোনও কিছু সরস করে বলার একটা সহজাত শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন। পড়াবার সময়ে তিনি যথাসাধ্য জটিলতা পরিহার ক'রে আলংকারিক ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতেন। পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিসাবে তাই তাঁকে ঠিক আদর্শ বলা না গেলেও তাঁর সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল, তিনি ছাত্রদের মধ্যে পদার্থবিদ্যার প্রতি ভালবাসা সঞ্চার করতে পারতেন। পরবর্তীকালে পদার্থবিদ্যায় কৃতবিদ্য হয়েছেন এমন ব্যক্তিই ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে চারুবাবুর বক্তৃতা শুনেই প্রথম পদার্থবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯২০-২১ সালে একবার

কলার ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞান-বিষয়ক সর্বজনবোধ্য বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। সে সময়ে চারুবাবু পদার্থবিদ্যার ওপর কয়েকটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। বাংলায় প্রাঞ্জল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত অনেকগুলি সহজবোধ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ তাঁকে রামেন্দ্রসুন্দর ও জগদীশচন্দ্রের অন্যতম উত্তরসাধকের গৌরব দান করেছে।

আমরা এমন একটা সময়ের কথা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, যখন সুদূর পশ্চিমে ক্ল্যাসিকাল বিজ্ঞানের বাঁধ ভেঙে আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপর ভিত্তি ক'রে পদার্থবিদ্যা নবজন্ম লাভ করছে এবং স্থান, কাল ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে মানুষের দীর্ঘদিনের চিন্তা-ভাবনা পাল্টে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের প্রধান পদার্থবিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে সেই সঙ্গে চলছে একটা প্রচণ্ড উন্মাদনা ও অস্থিরতার যুগ। তার সমসাময়িক প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে তাকালে আমাদের খানিকটা হতাশই হ'তে হয়। এখানকার সব কিছুই তখনও ছিল গতানুগতিক। ছাত্ররা প্রবীণ অধ্যাপকদের সমীহ ক'রে এড়িয়ে চলতেন। অধ্যাপকরাও ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তাধারা ও মননশক্তিকে উজ্জীবিত ক'রে তুলবার মতো ছাত্রদের অতটা ঘনিষ্ঠতায় আসার চেষ্টা করেননি। পদমর্যাদায় প্রবীণ অধ্যাপকদের মধ্যে বরঞ্চ অনেক সময়ে শিক্ষকতাকার্যে আগ্রহ ও যত্নের অভাবই চোখে পড়ত (এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছিলেন কুলেশচন্দ্র কর)। দ্বিজেনবাবু, চারুবাবু প্রমুখ শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের পর একটা সময়ে প্র্যাকটিকাল ক্লাসগুলো শোচনীয়ভাবে অবহেলিত হ'ত রুটিনে প্রবীণ শিক্ষকদের নাম থাকত, কিন্তু প্র্যাকটিকাল ক্লাসে তাঁদের অনেক সময়েই দেখতে পাওয়া যেত না। থিওরির ক্লাসেও কোর্স প্রায়ই শেষ হ'ত না। সে সময়ে পরীক্ষায় সিলেবাস-বহির্ভূত প্রশ্ন আসাটা একটা প্রথাই ছিল এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা খুবই নগণ্য হ'ত। এই সময়কার অনেক অসাধারণ মেধাবী ছাত্রেরও প্রথম বিভাগ না পাওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে অন্ততঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের তেমন একাধিপত্য ছিল না। স্কটিশ চার্চ প্রভৃতি কয়েকটি কলেজকে ঐ সময়ে প্রেসিডেন্সির প্রায় সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীই বলা চলত।

দু' একজন ব্যতিক্রম বাদে সাধারণভাবে এই যুগের শিক্ষাদানের মানকে খুব উচ্চ বলা না গেলেও এই যুগের ছাত্রদের মধ্য থেকে আমরা পরবর্তীকালের অনেক কৃতী ব্যক্তিকে পেয়েছি। পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন যুগান্তকারী আবিষ্কার তখন মানুষের সমাজ, সভ্যতা ও চিন্তাধারার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সবেমাত্র আরম্ভ করেছে। ফলে এখনকার চেয়ে কম সংখ্যায় হ'লেও মেধাবী ছাত্ররা কিজিক্স পড়তে আসতেন। তাঁদের মধ্যে আমরা যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি, তাঁরা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন, কলেজের সেই সময়কার খাপছাড়া পঠন-পাঠন থেকে তাঁরা খুব একটা উপকার পাননি ; নিজেদের পড়াশুনা তাঁদের নিজেদেরই ক'রে নিতে হ'ত। সেই যুগের ছাত্ররা বাইরের জগতের কথা জানতেন কম এবং এখনকার তুলনায় উচ্চাশা-পরায়ণও হ'তেন কম। সুযোগের অভাবে পাশ্চাত্যে গিয়ে উচ্চতর গবেষণা করার ইচ্ছাটা সকালের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে অতটা দানা বাঁধতে পারে নি। তাই অনেকেই শিক্ষকতাকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফলে আমাদের আলোচ্য এই যুগ তার অব্যবহিত পরবর্তী যুগকে কিছু উৎকৃষ্ট শিক্ষক উপহার দিয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সব দেশেই এমন অনেক মানুষ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে এসেছেন, যাঁরা অন্য কোনও যুগে জন্মালে হয়তো কবি বা শিল্পী হ'তেন। তিরিশের দশকে এই বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে একবার সাহিত্যচর্চার বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। শিক্ষকদের মধ্যে প্রশান্ত মহলানবীশ ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রধানতঃ প্রশান্তবাবুর উদ্যোগেই ১৯২৭ সালে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার জন্য 'রবীন্দ্র পরিষদ' স্থাপিত হয়। পদার্থবিদ্যার বড় বক্তৃতা-কক্ষটিতে (P. L. Tতে) এই পরিষদের অধিবেশন হ'ত এবং পদার্থবিদ্যার ছাত্ররা তাতে বিশিষ্ট অংশ নিতেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং আরও অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির এখানে সমাবেশ ঘটত। দুর্ভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর এই পরিষদটিও জীবন্মৃত হ'য়ে পড়ে।

এবার আমরা অত্যন্ত ঘটনাসংকুল চল্লিশের দশকে প্রবেশ করব। এর গোড়াতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে বাঙালীর জীবনকে কি পরিমাণে বিপর্যস্ত করেছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন অবস্থায় কলেজের দৈনন্দিন কাজকর্মও যে নিয়মমাফিক হ'তে পারে না, সেটা সহজেই অনুমেয়। স্নেহময় দত্তের গবেষণাকক্ষটি সমেত পদার্থবিদ্যা বিভাগের অনেকগুলি ঘর এই সময়ে এ. আর. পি.কে ছেড়ে দিতে হয়। যুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের কলেজে যাতায়াত করাটাই বিপজ্জনক হ'য়ে উঠেছিল। অবশেষে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর খানিকটা স্থিতি আসে। তার পরের যুগের কথা আমরা বলব আমাদের আলোচনার পরবর্তী অংশটিতে।

ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালে সহশিক্ষার প্রচলন সমগ্র কলেজেই বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। অবশ্য গোড়ার দিকে পদার্থবিদ্যা বিভাগে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং তখন ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরা খানিকটা ব্যবধান রেখে চলতেন। পরে অবশ্য পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি মেয়েদের মধ্যে পদার্থবিদ্যা পড়ার রীতিমতো আগ্রহ দেখা গিয়েছিল এবং তখন থেকেই ছেলেরা ও মেয়েরা সহজভাবে মেলামেশা করতে আরম্ভ করেন। ১৯৪৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাস পাঠক্রম তুলে দেওয়া হয় এবং তখন থেকেই পাস ক্লাস অত্যন্ত অবহেলিত হ'তে থাকে। এই অবহেলার এক মারাত্মক কুফল হ'ল, এর জন্য পদার্থবিদ্যার অনেক ছাত্রের গণিতের ভিত্তি দুর্বল থেকে যায়। এই সমস্যার এখনও সমাধান হয় নি।

এর মধ্যে পদার্থবিদ্যার শিক্ষক-তালিকাতে হঠাৎ একটা বেশ বড়রকমের অদল-বদল ঘটল। আমাদের আলোচিত শিক্ষকদের মধ্যে স্বাধীনতার পরেও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন একমাত্র কুলেশচন্দ্র কর ; অবশ্য ১৯৪৫ সালে তিনি একবার বছর তিনেকের জন্য রাজশাহী কলেজে বদলী হ'য়ে গিয়েছিলেন। এই বিভাগে নূতন যোগদান করলেন কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষক—অবিনাশচন্দ্র সাহা (১৯৩৯—৪৭), অমরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯৪০—৫০), রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত (১৯৪১—৪৮, ৫০—৬৬), সরোজবন্ধু সান্যাল (১৯৪৩—৫৭), পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯৪৪—৫৮) এবং দুর্গাপ্রসন্ন আচার্য (১৯৪৫—৬০)। এঁদের মধ্যে একমাত্র রাজেন সেনগুপ্তই তখন বয়সে তরুণ ;

অন্যরা এলেন দীর্ঘ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে। এই বিভাগের ইতিহাসে এতজন উৎকৃষ্ট শিক্ষকের এককালীন সমাবেশ আগে আর কখনও হয় নি।

১৯৪৫ সালে প্রশান্ত মহলানবীশ কলেজের অধ্যক্ষের কর্মভার গ্রহণ করলে বিভাগীয় প্রধান হলেন অমরেশ চক্রবর্তী। পড়ানোর ক্ষমতার জন্য তো বটেই, একটি গভীর স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের জন্যও তিনি ছাত্রদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই বিভাগের ইতিহাসে সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম পদমর্যাদায় প্রবীণ শিক্ষক, যাঁর সঙ্গে ছাত্ররা সহজেই প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে তুলতে পারতেন। যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরাই তাঁর অসাধারণ চরিত্রমাধুর্যে ও স্নিগ্ধ রসবোধে বিমুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর কৃতজ্ঞ ছাত্রদের কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি, বিভাগের অনেক দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের তিনি ছিলেন অভিভাবক-স্বরূপ। পদার্থবিদ্যা বিভাগের ইতিহাসে তাঁর বিরাট অবদান, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে সহজতর করা এবং নানা ঘটনায় বিপর্যস্ত বিভাগটিকে আবার গুছিয়ে তোলা। একটু পরেই আমরা দেখব, বিভাগীয় প্রধান হিসাবে তাঁর সংক্ষিপ্ত কর্মকালের শেষদিকেই এই বিভাগের একটি অত্যন্ত গৌরবের যুগ আরম্ভ হয়।

প্র্যাকটিকাল ক্লাসের যে এক সময়ে অত্যন্ত দুর্দশা দেখা দিয়েছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সরোজবন্ধু সান্যাল, পূর্ণ মুখার্জী প্রমুখ কয়েকজন পরিশ্রমী ও কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক চল্লিশের দশকের শেষ দিকে এই অবহেলিত প্র্যাকটিকাল ক্লাসগুলোকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁরা নিয়মিত প্র্যাকটিকাল ক্লাসে গিয়ে ধ'রে ধ'রে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। সরোজবাবুর সম্পর্কে তাঁর ছাত্ররা বলেন, কোনও যন্ত্রপাতিতে খুঁত থাকলে মুহূর্তের মধ্যে তা ধ'রে ফেলার একটা অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। ল্যাবরেটরির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যায় মৌলিক গবেষণাও আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে পথিকৃৎ ছিলেন রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত। তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এই ইতিহাসের পরবর্তী অংশটিতে পাওয়া যাবে।

১৯৪৭ সালে যখন দেশ স্বাধীন হ'ল এবং সর্বত্র একটা স্থিতি এল, সেই সময়কার পদার্থবিদ্যা বিভাগের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, কয়েকজন গুণী শিক্ষকের সমাবেশ এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ও পঠন-পাঠনের মানের অনেকখানি উন্নতির ফলে একটি গৌরবের যুগের ঊষালগ্ন ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে।

॥ ১৯৪৭—৭৬ ॥

এই পদার্থবিদ্যা বিভাগের ইতিহাসে কোনও যুগকে যদি স্বর্ণযুগ বলা চলে, তবে তার ব্যাপ্তি স্বাধীনতার পর থেকে মোটামুটি ষাটের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পদমর্যাদায় প্রবীণ অধ্যাপকদের মধ্যে অমরেশবাবুই প্রথম ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে শুরু করেন। তাঁর পরে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত। অমরেশবাবুকে ছাত্ররা

বিভাগীয় প্রধান ব'লে তবু খানিকটা সমীহ ক'রেই চলত। কিন্তু রাজেনবাবুর সেসব কিছুর বালাই ছিল না। গোড়া থেকেই তিনি ছাত্রদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে ভাব জমাতে থাকেন। সরোজবন্ধু সান্যাল, পূর্ণ মুখার্জী ও ব্রজেন্দ্রকুমার সেন যখন প্র্যাকটিকাল ক্লাসে শৃঙ্খলা আনলেন, তখনও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অনেকটা ঘনিষ্ঠতর হ'ল ; কেননা থিওরির ক্লাসের চেয়ে প্র্যাকটিকাল ক্লাসেই ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুযোগ বেশী। অনেক উদ্যমী শিক্ষকই যত্ন ক'রে পড়ানোটাকে শুধু যে একটা পালনীয় দায়িত্ব ব'লে মনে করতে লাগলেন তাই নয়, শিক্ষকতা কাজটাই তাঁদের কাছে একটা আনন্দের উৎস হ'য়ে উঠল। এক কথায় পদার্থবিদ্যা বিভাগের চেহারাটাই এই সময়ে অনেকটা পাল্টে গেল।

১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ পূর্ণবাবু, রাজেনবাবু প্রমুখের চেষ্টায় টিউটোরিয়াল ক্লাসের গোড়াপত্তন হয়। এছাড়া প্রধানতঃ পূর্ণবাবুর উদ্যোগে প্রতি শনিবার ছুটির পরে কোর্সের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চতুর্থ বর্ষের (সে সময়ের final year) ছাত্র এবং অধ্যাপকদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা হয়। দুঃখের বিষয়, এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাটি দীর্ঘজীবী হয় নি। এ ধরণের আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা গেলে বর্তমানের ছাত্রছাত্রীরাও যথেষ্ট উপকৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। টিউটোরিয়াল ক্লাসের প্রথাটি অনিয়মিতভাবে হ'লেও অনেকদিন চলেছিল। পরে ১৯৭৪ সালে তাও বন্ধ হ'য়ে যায়।

এই স্বর্ণযুগের মাঝামাঝি থেকে পদার্থবিদ্যা পড়ার একটা প্রচণ্ড হুজুগ দেখা যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দিকে একমুখী আগ্রহের ফলে কলার দিকে মেধাবী ছাত্রের সংখ্যা দিন দিন কমে যেতে থাকে। এমন একটা পরিস্থিতি সমাজদেহের পক্ষে স্বাস্থ্যকর কিনা সেটা সমাজবিজ্ঞানীদের বিবেচ্য। যাই হোক্, এই সময় থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সি কলেজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠতে থাকে। বিশেষতঃ ১৯৬০ সালে ত্রিবার্ষিক স্নাতক পাঠক্রম চালু হবার পর পদার্থবিদ্যার B.Sc. পরীক্ষায় প্রথম কয়েকটি স্থানে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রায় একচেটিয়া অধিকার জন্মে যায়। ষাটের দশকের শেষভাগে ও সত্তরের দশকে গোড়ায় ছাত্র অসন্তোষের জন্য কিছুদিন এখানকার পঠন-পাঠনে ব্যাঘাত ঘটেছিল। ১৯৬৯ সালে স্নাতকশ্রেণীর গবেষণাগারের কিছু যন্ত্রপাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ছাত্রদের পরীক্ষার ফলের এতে বিশেষ কোনও হেরফের হয় নি। পঞ্চাশের দশকের 'সেই Tradition আজও সমানে চলছে।

১৯৪৫ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধানের কাজ চালিয়ে অমরেশবাবু অবসর গ্রহণ করলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন কুলেশচন্দ্র কর। কুলেশবাবু অবসর গ্রহণ করেন ১৯৫৫ সালে। তখন থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধান ছিলেন রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত। স্বর্ণযুগের সৃষ্টির জন্য আমরা অমরেশ চক্রবর্তী, কুলেশ কর, রাজেন সেনগুপ্ত—পর পর এই তিনজন সুযোগ্য বিভাগীয় প্রধানের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। অমরেশবাবু ও কুলেশবাবুর সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কুলেশবাবুর শেষজীবনের কর্মপ্রচেষ্টার বিবরণ শুধু দিতে বাকী রয়েছে।

১৯৫৩ সালে কুলেশবাবু আক্ষরিক অর্থে নিজের সর্বস্ব দিয়ে 'তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠান' (Institute of Theorteical Physics) গ'ড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে 'Indian Journal

of Theoretical Physics' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। শিক্ষকতাজীবনের শেষ দিকে তিনি পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়নে আগ্রহী হ'য়ে ওঠেন এবং Statistical Mechanics (1953), Mechanics (1955) ও Sound (1958) এর ওপর কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজ পদার্থবিদ্যা বিভাগের তৃতীয় (জগদীশচন্দ্র ও প্রশান্তচন্দ্রের পরে) এবং এখনও পর্যন্ত সর্বশেষ ইমেরিটাস অধ্যাপকের সম্মান দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর শেষ জীবন আনন্দময় হয় নি। স্ত্রী-বিয়োগের পর গভীর নিঃসঙ্গতার মধ্যে এই নিঃসন্তান বিজ্ঞানীর বার্ধক্য কেটেছিল। Wave-Statistics-এর ব্যাপারে মতভেদ হওয়ায় তাঁর অনেক প্রতিভাবান তরুণ সহকর্মীর পক্ষে শেষ দিকে আর তাঁর সঙ্গে গবেষণা করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে নি। কুলেশবাবুর মহত্ত্বের সবচেয়ে বড় পরিচয় হ'ল, এঁদের সঙ্গে তার পরেও কখনও তাঁর সম্পর্ক তিক্ত হয়নি। একেবারে শেষ বয়সে চোখে ছানি প'ড়ে তাঁর দৃষ্টিশক্তি প্রায় নষ্ট হ'য়ে যায়। সংসারের প্রতি গভীর অভিমান ক'রেই যেন তিনি সেই ছানি কাটান নি। কিন্তু তবুও ১৯৭৫ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁর গবেষণায় কখনও ছেদ পড়ে নি। দীর্ঘ জীবনে তাঁর রচিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা শতাধিক। ইংরাজী ও জার্মান ভাষা ছাড়াও এর মধ্যে শেষ জীবনের কয়েকটি গবেষণাপত্র বাংলায় লিখিত। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে এ ঘটনাটি যে একদিন সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হবে, তা বলা বাহুল্য মাত্র।

পঞ্চাশের দশকে ও ষাটের দশকে এই বিভাগে নতুন শিক্ষক যাঁরা এসেছেন, তাঁদের অনেকের কাছেই আমরাও অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছি। এখনকার শিক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারেন রাসবিহারী চক্রবর্তী এবং তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন হেমেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। এঁরা এখানে এসেছেন যথাক্রমে ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে। এঁদের দু'জনেই মাঝখানে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র বদলী হ'য়ে গেলেও এঁদের দীর্ঘকালের কর্মক্ষেত্র এই প্রেসিডেন্সি কলেজই। যাঁরা এখনও এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁদের শিক্ষকতাকার্যের কোনও মূল্যায়ন এখনই করা চলে না। সে দায়িত্ব ভাবীকালের ওপর। রাসবিহারীবাবু বা হেমেনবাবুর সম্পর্কে আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি, তাঁদের মতো শিক্ষক পাবার জন্য আমরা গর্বিত।

আমাদের আলোচ্য স্বর্ণযুগ মৌলিক গবেষণার জন্য স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। এর প্রারম্ভেই আমরা এই বিভাগে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় কুলেশচন্দ্র করকে এবং পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যায় রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তকে নিরলস গবেষণায় রত দেখি। এদের সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে একের পর এক এলেন পরেশকিশোর সেনচৌধুরী (১৯৫১—৫৪, ৫৮—৭২), সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল (১৯৫৬—৭৫), বিজয়শঙ্কর বণিক (১৯৫৭—), অমলকুমার রায়চৌধুরী (১৯৬১—), শ্যামল সেনগুপ্ত (১৯৬১—৬৫, ৭৩—)। এই পদার্থবিদ্যা বিভাগে গবেষণার ক্ষেত্রে এত আগ্রহ ও উদ্দীপনা আর কখনও দেখা যায় নি। এর আগে এখানে গবেষণা—বিশেষ ক'রে পরীক্ষামূলক গবেষণা—করেছেন জগদীশচন্দ্র বা স্নেহময় দত্তের মতো একক কর্মীরা। হঠাৎ যেন এখানকার একতলার ল্যাবরেটরিগুলো রূপকথার রাজকন্যার মতো সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠল। এর জন্য আমরা সবচেয়ে বেশী ঋণী রাজেনবাবুর কাছে। উপরোক্ত

শিক্ষক-গবেষকদের অনেককে তিনি এখানকার বিভাগীয় প্রধান থাকার সময়ে এখানে এনে একত্রিত করেছিলেন। খানিকটা উচ্ছ্বাসপ্রবণ এই বিচিত্র মানুষটির ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঠিক বর্ণনা দিয়ে বোঝানো কঠিন এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছতা ও অকৃত্রিমতা ছিল যে তাঁর পক্ষে নিজের চারিধারে একটি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী গ'ড়ে তোলা কঠিন হয় নি। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। পদার্থবিদ্যা বিষয়টির মধ্যে একই সঙ্গে জটিলতা ও শৃঙ্খলার এমন একটা বিস্ময়কর সমন্বয় চোখে পড়ে যে মহৎ পদার্থ-বিজ্ঞানীকেও কোনও প্রাথমিক বিষয় পড়াতে হ'লে দস্তুরমতো প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে আসতে হয়। এই কারণেই দেখা যায়, যাঁরা মৌলিক গবেষণায় রত, তাঁরা অনেক সময়ে পড়ানোর প্রস্তুতিতে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না ব'লে তাদের পড়ানোতে যত্নের অভাব ঘটে। অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার, উপরোক্ত সব্যসাচীরা একই সঙ্গে গবেষণা ও অধ্যাপনায় সমান যত্ন ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন। এবার আমরা তাঁদের বিষয়ে আলোচনা করব।

রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত এক সময়ে ক্লাউড চেম্বার নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণায় ব্ল্যাকেটের সহযোগিতা করেছিলেন। ব্ল্যাকেটের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তি ভাষণে (১৯৪৮) সেই সহযোগিতার স্বীকৃতি আছে। দেশে ফিরেই ১৯৪১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করার পর এখানকার সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাঁর কয়েক বছর সময়ে লেগেছিল। স্বাভাবিক দক্ষতায় তিনি ছাত্রমহলে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তাঁর ক্লাসে ছাত্রদের বাক্-স্বাধীনতা ছিল। মেধাবী ছাত্ররা অনেক সময়ে তাঁর কথার বিরোধিতাও করতেন এবং রাজেনবাবু স্বয়ং তাতে উৎসাহ দিতেন। ১৯৬৬ সালে তিনি কয়েক মাসের জন্য মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যক্ষ হ'য়ে চ'লে যান এবং তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে আবার এই কলেজে ফিরে আসেন। বর্তমানে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

ভারতবর্ষে কাউন্টার-নিয়ন্ত্রিত ক্লাউড চেম্বার নিয়ে গবেষণায় রাজেনবাবুই পথিকৃৎ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে তিনি কলেজে এই ধরণের একটি চেম্বার তৈরী করেন। আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত ক্লাউড চেম্বারের নির্মাণে তিনি সাহায্য করেছেন। পরবর্তীকালে ফ্ল্যাশ টিউব ডিটেকটর ও স্পার্ক চেম্বার তৈরীতেও এদেশে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। ১৯৫০ সালে দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরার কিছুকাল পরেই তিনি এখানে আরেকটি বৃহত্তর ক্লাউড চেম্বার নির্মাণ করেন এবং μ-মেসনের ভর নির্ণয় ও পরমাণুর কেন্দ্রীণের ক্রিয়ায় তার বিক্ষেপণের ওপর গবেষণা করেন। সেই গবেষণায় লব্ধ ফল ব্যবহার করে তিনি কেন্দ্রীণের আয়তনের উপর সমীক্ষা চালান। উপযুক্ত Accelerator না থাকায় তাঁকে μ-মেসন পাবার জন্য নির্ভর করতে হ'ত কস্মিক রশ্মির ওপর। কস্মিক রশ্মি যে মহাশূন্যের সব দিক থেকেই সমানভাবে পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে তা তাঁর পরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত হয়। কস্মিক রশ্মি নিয়ে আরও ভালোভাবে গবেষণা করার জন্য তিনি কলেজের রসায়ন বিভাগের ওপরের ছাদে দু'টি ঘর নির্মাণ করান। কিন্তু পরে আর সেখানে কাজ করার সুযোগ তিনি ক'রে উঠতে পারেন নি।

১৯৫১-৫৪ সালে পরেশকিশোর সেনচৌধুরীও এখানে কাউন্টার নিয়ন্ত্রিত ক্লাউড চেম্বারের সাহায্যে কস্‌মিক রশ্মির ওপর গবেষণা করেছিলেন। তাঁর গবেষণা ইলেকট্রন-পজিট্রন সংঘর্ষে দু'টি নতুন ধরণের কণা উদ্ভবের সম্ভাব্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে। পরবর্তীকালে (১৯৬৮-৭২) আবার যখন তিনি অনেকদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সে সময়ে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা স্পার্ক চেম্বারের উন্নতি সাধন করেন।

১৯৬৬ সালে রাজেনবাবুর পর এখানকার বিভাগীয় প্রধান হলেন সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল। তাঁর ছাত্রদের কাছে তাঁর পড়ানো ছিল একটি অভিজ্ঞতা বিশেষ। ছাত্ররা প্রায় সম্মোহিত হ'য়ে শুনতেন, তিনি কিভাবে অবলীলাক্রমে অতি জটিল বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ ক'রে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চ'লে যাচ্ছেন। ১৯৭৫ সালে ডঃ ঘোষাল Director of Secondary Education হ'য়ে এই বিভাগ থেকে বিদায় নেন। মাঝখানে তিনি স্বল্পকালের জন্য একবার কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

ডঃ ঘোষাল ও তাঁর সহকর্মীরা কিছুকাল Nuclear Physics-এর উপর গবেষণা করেছিলেন। উচ্চশক্তির একঝাঁক প্রোটন যদি সমান্তরাল রেখা বরাবর খুব পাতলা কোনও ভারী ধাতুর (যেমন সোনার) পাতের ওপর এসে পড়ে, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক প্রোটনের Rutherford হবে। বাইরে থেকে ফোটোগ্রাফিক প্লেট আনিয়ে বিভিন্ন কোণে নিক্ষিপ্ত প্রোটনের সংখ্যা গণনা করা হয় এবং প্রাপ্ত বণ্টনসূত্রের একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। তবে ডঃ ঘোষালের প্রধান কাজ Mass spectrometer-এর ওপর। ১৯৫৭ সালে যখন তিনি কানাডায় গিয়েছিলেন, তখন এর টিউবটি নিয়ে আসেন। যন্ত্রটির বাকী অংশ এই কলেজেই তৈরী হয়। এই কাজে ডঃ ঘোষালই কলকাতায় প্রথম। এই যন্ত্রের বিশ্লেষনী ক্ষমতা যে গ্যাসের চাপের ওপর নির্ভর করে, তা আগেই জানা ছিল ; কিন্তু চাপের ওপর নির্ভরশীলতার এই ধরনটিও যে গ্যাসের আণবিক ভরের ওপর নির্ভরশীল সেটা এখানেই প্রথম দেখানো হয়। এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হ'ল বিভিন্ন ধরণের আণবিক সংঘর্ষের আপেক্ষিক প্রাধান্যের তত্ত্ব থেকে।

১৯৭৫ সালে ডঃ ঘোষাল চ'লে যাবার পর বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিজয়শঙ্কর বসাক। তিনি ১৯৫৮ সালে একটি X-ray Crystallography-র ল্যাবরেটরি স্থাপিত করার পর থেকে এখনও সেখানে গবেষণা ক'রে যাচ্ছেন। তাঁর প্রথম কাজ Phenanhtrene নামে একটি জৈব যৌগের কেলাসের গঠন নির্ণয়। এই কাজে তিনি Single Crystal X-ray Diffraction Analysis প্রণালী ব্যবহার করেন। এর পর তিনি ও তাঁর সহকারীরা আরও কয়েকটি কেলাসের যথা :—Cyclopentenophenanthrene, Sterols, Hormones, Carbazole, Indole, Phenanthridine, Hydroxyquinoline প্রভৃতির গঠন নির্ণয় করেন। জটিল গঠনের দু'টি Sterol, Cholestane এবং Testosterone-এর কেলাস গঠনের উপরেও অনেকখানি কাজ এগিয়েছে। এইসব গবেষণায় দেখা গেল যে উপরের যৌগগুলিতে বেন্‌জিন বৃত্তের বন্ধনীর দৈর্ঘ্য সাধারণ নির্দিষ্ট মান থেকে আলাদা। Mulliken এবং Hund-এর আণবিক কক্ষপথের তত্ত্ব থেকে গণনা করে দেখা গেছে, এই ধরণের

বিচ্যুতি ঘটে "Mobile π-electron"-এর জন্য। বর্তমানে ডঃ বসাক ও তাঁর সহকারীরা কিছু স্টেরল, হরমোন, কয়েকটি টিউমার প্রতিরোধক যৌগ এবং আরও কয়েকটি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যৌগ নিয়ে বিশ্লেষণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

অমলকুমার রায়চৌধুরীর প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকা-কালীন গবেষণা প্রধানতঃ সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও বিশ্বতত্ত্বের (Cosmology) উপর। নিউটন-ম্যাক্সওয়েলের সনাতন আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী চার্জবিশিষ্ট বস্তুকণার আভ্যন্তরীণ সাম্যের শর্ত হ'ল চার্জ ও ভরের মধ্যে একটি বিশেষ অনুপাত; কিন্তু আমাদের পরিচিত বস্তুকণার (যেমন ইলেকট্রনের) ক্ষেত্রে এই অনুপাত অনেক বেশী। ডঃ রায়চৌধুরী ও তাঁর সহকারীরা প্রথমতঃ দেখিয়েছেন যে যদি বস্তুকণা সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ গতিশূন্য হয়, তবে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ীও একই অনুপাত পাওয়া যায়। কিন্তু যদি কণাটি ঘূর্ণায়মান ধ'রে নেওয়া হয়, তবে এমন অবস্থা কল্পনা করা সম্ভব, যখন চার্জের পরিমাণ যতখুশী বেশী হ'তে পারে। তবে এভাবে ইলেকট্রনের মডেল তৈরী করার পথে অনেক অসুবিধা আছে। বিশ্বতত্ত্বের ক্ষেত্রে মহা-বিস্ফোরণের (Big-bang) অস্তিত্ব এবং ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা নির্দিষ্ট ধ'রে নিলে স্বীকার করতে হয় যে কাল অনন্ত নয়। ডঃ রায়চৌধুরী ও তাঁর সহকারীরা এখানে দেখিয়েছেন, যদি অনন্ত বিশ্বে পদার্থের পরিমাণ সীমিত হয়, অর্থাৎ যদি মহাবিশ্বে পদার্থের গড় ঘনত্ব শূন্য হয়, তবে ঘটনার ধারা-বাহিকতা নির্দিষ্ট রেখেও অনন্তকালে বিদ্যমান বিশ্বের অস্তিত্ব কল্পনা সম্ভব। অতি অধুনা নানা দিক থেকে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে কিছু কিছু পরিবর্তন করার প্রস্তাব হয়েছে। এই পরিবর্তন গ্রহণ করলে মহাবিশ্বের আদি অবস্থা কি থাকা সম্ভব তাই নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলছে।

১৯৬১—৬৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকজীবনের প্রথম পর্বে শ্যামল সেনগুপ্ত নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যার উপর কাজ করেছিলেন। তার পরে কয়েক বছর মৌলানা আজাদ কলেজে অধ্যাপনা ক'রে আবার এখানে ফিরে এসে ১৯৭৪ সালে তিনি সলিড স্টেট ফিজিক্সের একটি নূতন ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছেন। সেখানে প্রধানতঃ আয়নিক ক্রস্ট্যালের ল্যাটিস বলবিদ্যার ওপর গবেষণা হচ্ছে; Deformable shell Model নামক একটি মডেল উদ্ভাবন ক'রে তাঁরা এই ধরণের ক্রস্ট্যালের ধর্মনির্ণয়ে তিনটি পরমাণুর বিক্রিয়াজনিত শক্তির গুরুত্ব প্রমাণ করেন। এছাড়া তাঁরা এমন একটি Microscopic theory উদ্ভাবন করেন, যার সাহায্যে শুধুমাত্র আয়নের চারপাশের ইলেকট্রনসমূহের বিন্যাস থেকেই কোন আয়নিক ক্রস্ট্যালের ধর্ম নির্ণয় করা যাবে। অধুনা নানাদিক থেকে ম্যাক্স বর্নের ল্যাটিস তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সংগতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। ডঃ সেনগুপ্ত ও তাঁর সহকারীরা এই সন্দেহ দূর করে বর্নের তত্ত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন।

সুদীর্ঘ পরিক্রমা শেষ ক'রে আমরা এতক্ষণে বর্তমানে এসে পৌঁছেছি। এখনকার একটি সমস্যার কথা এবার বলা প্রয়োজন। সত্তরের দশকের গোড়ায় পদার্থবিদ্যা সমেত প্রেসিডেন্সি কলেজের সমস্ত বিভাগেই ছাত্র ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষার প্রচলন হয়। কিন্তু এর ফলে পদার্থবিদ্যা বিভাগের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়েছে ব'লে অনেকে মনে করেন। এই পরীক্ষায় যারা উচ্চস্থান

অস্বীকার করে, তারা অনেকেই এখানে ভর্তি হ'য়ে তারপর ডাক্তারি বা অন্য কোনও পাঠক্রমে চ'লে যায়। ততদিনে পরবর্তী স্থানাধিকারীরা অন্য কলেজে ভর্তি হ'য়ে ক্লাস করতে শুরু ক'রে দেয়। ফলে বিভাগের বত্রিশটি আসনের মধ্যে প্রত্যেক বছরই বেশ কয়েকটি খালি প'ড়ে থাকে। এমন হওয়াটা নিঃসন্দেহে বাঞ্ছনীয় নয়।

বর্তমানে আমাদের বিভাগীয় প্রধানের গুরুত্বপূর্ণ পদটি অলংকৃত করছেন বিজয়শঙ্কর বসাক। এছাড়া শিক্ষকতাকার্যে ব্যাপৃত আছেন অমলকুমার রায়চৌধুরী, শ্যামল সেনগুপ্ত, রাসবিহারী চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মদনগোপাল বসাক প্রমুখ প্রবীণদের পাশে পাশে কয়েকজন তরুণতর শিক্ষক, যাঁদের কর্মজীবনের বেশী অংশটাই মহত্তর সম্ভাবনা নিয়ে এখনও সামনে প'ড়ে রয়েছে। তাই তাঁদের কথা বর্তমান আলোচনার ক্ষুদ্র পরিসরের অন্তর্ভুক্ত না করাটাই আমরা সমীচীন মনে করলাম।

॥ উপসংহার ॥

এই বিভাগের আজ থেকে পনের বছর আগেকার চেহারার সঙ্গে এখনকার চেহারাটা মিলিয়ে দেখলে একথাটা স্বীকার করতেই হয়, তখনকার সেই জৌলুস আজ খানিকটা ম্লান হ'য়ে এসেছে। স্বর্ণ-যুগের ঔজ্জ্বল্যের মধ্যেই বোধ হয় তার পরবর্তী যুগের আপেক্ষিক নিষ্প্রভতার বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল। পঞ্চাশের দশক থেকে আমরা পদার্থবিদ্যার মেধাবী ছাত্রদের দেশে ও বিদেশে গবেষণার সুযোগ ক্রমেই বেড়ে চলতে দেখি। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে নি। অর্থাভাবে কলেজের লাইব্রেরীর পক্ষে উচ্চতর বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিখ্যাত জার্নালগুলি ক্রয় করাও দিন দিন অসম্ভব হয়ে পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে গবেষণাকার্যেও ভাঁটা পড়ল। প্রেসিডেন্সি কলেজ চিরকালই মূলতঃ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এখানে যাঁরাই গবেষণা করতে চেয়েছেন, তাঁদেরই বহু বাধা-বিঘ্ন ঠেলে এগোতে হয়েছে। এই সব বাধা ক্রমেই প্রায় অনতিক্রমণীয় হ'য়ে উঠতে থাকে। এর ওপর তো হচ্ছে সরকারী চাকরীর আরেক মূর্ত অভিশাপ—বদলী। যেখানে স্থায়িত্বকাল সম্পর্কেই কোনও নিশ্চয়তা নেই, সেখানে গবেষণাকার্যে চালাতে যে কতখানি অদম্য মনোবল লাগে তা সহজেই অনুমেয়। স্বর্ণযুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পাওয়াটা হঠাৎ অনেকখানি সহজ হ'য়ে যায় এবং যে বহু-সাধক ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যেক বছর প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'তে থাকেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা উচ্চতর গবেষণায় আগ্রহী তাঁদের অনেকের কাছেই সরকারী কলেজে শিক্ষকতা করাটা খুব একটা কাম্য মনে হ'ল না। আকাশে ডানা মেলতে যাঁদের উচ্চাশা, তাঁরা প্রেসিডেন্সি কলেজের সংকীর্ণ খাঁচায় আবদ্ধ হ'তে চাইলেন না।

তাই স্বর্ণযুগের গোধূলিচ্ছায়ায় এসে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে যখনই কোনও দিকপাল অধ্যাপক-গবেষক চ'লে যাচ্ছেন, তাঁর আরব্ধ কর্মযজ্ঞের ভার তাঁর হাত থেকে আর কেউ নিচ্ছেন না। তাই রাজেন সেনগুপ্তের ব্যবহৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতিতে ধূলো জমছে। অধ্যাপক

সেনচৌধুরী বা অধ্যাপক ঘোষাল যেসব যন্ত্রে কাজ করছিলেন তাও হয়তো শীঘ্রই অব্যবহার্য হ'য়ে পড়বে। সম্ভবতঃ এর প্রধান কারণ হ'ল পদার্থবিদ্যায় উৎসর্গিত-প্রাণ একদল ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষককে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে আমরা কখনও চেষ্টিত হই নি। এখনও যদি সে চেষ্টার অভাবটা আমরা সবাই বুঝতে পারি, তবে বলব, অভাবটা বুঝতে আমাদের যথেষ্ট দেরী হ'লেও একেবারে অসংশোধনীয় রকমের দেরী হ'য়ে যায় নি ; কেননা এখনও কয়েকজন অধ্যাপক বহু অসুবিধা সত্ত্বেও এখানে গবেষণা করে যাচ্ছেন। কিন্তু কয়েক বছর পরে হয়তো তাঁরাও আর এখানে থাকবেন না।

সবশেষে বলতে চাই, নিপুণ সাঁতারুর গলায়-বাঁধা পাথরের মতো একটি বিরাট বোঝা আমাদের নিম্নাভিমুখী করে রাখছে। সে বোঝার নাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। গত পাঁচ-ছয় বছর ধ'রে এই বিচিত্র অচলায়তনটির নীচে সমাধিস্থ হবার আশংকাটা ক্রমেই একটা নিদারুণ দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে। স্বীকার করি, এই সমস্যাটা সমগ্র প্রেসিডেন্সি কলেজেরই। তাহ'লেও আমরা আরও বিশেষভাবে তার গুরুত্বটা হাড়ে হাড়ে টের পাই ; কেননা পদার্থবিদ্যার বেলায় যুগ পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে সিলেবাস ও পঠন-পাঠন প্রণালী যত দ্রুতগতিতে পাল্টানো প্রয়োজন, অন্য বহু বিষয়ের বেলায় হয়তো তা নয়। গত পনের কুড়ি বছরের মধ্যে পৃথিবীর নানা জায়গায়—বিশেষ করে আমেরিকাতে—পদার্থবিদ্যার শিক্ষাদান প্রণালী নিয়ে কয়েকটি বৈপ্লবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু নিজের বিপুল বপু নিয়ে নড়া-চড়া করাটাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে, সেখানে এমন-ধারা অভিনব কোন কিছু প্রচলনের অসম্ভব কল্পনাটাই বাতুলতা! আপাতত তাই প্রেসিডেন্সি কলেজের স্বাধিকার-লাভের দুরাশায় হা-পিত্যেশ করা ব্যতিরেকে আমাদের আর কিছু করণীয় নেই।

যাই হোক, এই পদার্থবিদ্যা বিভাগকে ঘিরে আমাদের সকলেরই অনেক আশা-ভালোবাসা জড়িয়ে রয়েছে। এই বিভাগ আজও মরে নি, তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আজও থামেনি, এটাই হ'ল আমাদের শেষ কথা। আমাদের এই বিভাগের অতীতটা যেমন গৌরবোজ্জ্বল, তার ভবিষ্যৎটাও যেন তেমনই গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে এই কামনা করেই আমাদের আলোচনার ইতি টানছি।

——